বেলুড় মঠে কুমারী পূজা
স্বামী দেবেন্দ্রানন্দ
উদ্বোধন কার্যালয়

বেলুড় মঠে কুমারীপূজা

স্বামী দেবেন্দ্রানন্দ

উদ্বোধন কার্যালয়
কলকাতা

প্রকাশক
স্বামী নিত্যমুক্তানন্দ
উদ্বোধন কার্যালয়
১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার
কলকাতা-৭০০০০৩
E-mail : baghbazar.publication@rkmm.org

প্রথম প্রকাশ
শ্রীশ্রীমায়ের ১৪৯তম শুভ জন্মতিথি
২০ পৌষ ১৪০৮/৫ জানুয়ারি ২০০২

১১তম পুনর্মুদ্রণ
আশ্বিন ১৪২৫
September 2018
4M4C

ISBN 81-8040-251-7

মুদ্রক
রমা আর্ট প্রেস
৬/৩০ দমদম রোড
কলকাতা-৭০০০৩০

প্রকাশকের নিবেদন

প্রতি বছর বেলুড় মঠের দুর্গাপূজার মহাষ্টমী তিথিতে 'কুমারীপূজা' এক অনন্যসাধারণ অনুষ্ঠান। একটি অল্প বয়স্কা কুমারীকে মৃন্ময়ী দুর্গা প্রতিমার-সামনে বসিয়ে জগজ্জননী জ্ঞানে বা 'জ্যান্ত দুর্গারূপে' তাঁর পূজারাধনা সন্ন্যাসীদের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়, তা দেখার জন্য ঐ দিন বেলুড় মঠে খুব ভোর থেকেই হাজার হাজার দর্শনার্থীর ভিড় হয়, যা সামলাতে প্রচুর স্বেচ্ছা-সেবক নিয়োগ করতে হয়। পূজাশেষে জগন্মাতার আসনে অধিষ্ঠিতা সেই কুমারী কন্যাকে সকল সন্ন্যাসীর প্রণামও খুবই কৌতূহলোদ্দীপক ও দর্শনীয়। স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দও বেলুড় মঠের প্রথম দুর্গাপূজায় একইভাবে কয়েকজন কুমারীকে জগজ্জননী-জ্ঞানে পূজাশেষে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করেছিলেন। তাই এই 'কুমারীপূজা' সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের কৌতূহল অপরিসীম। এই কুমারীপূজা কি এবং কেনই বা দুর্গাপূজায় তা

অনুষ্ঠিত হয়—এর শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা এবং স্বামী বিবেকানন্দের এই পূজায় কেনই বা এত আগ্রহ ছিল তারই সংক্ষিপ্ত একটি ইতিহাস লেখক 'বেলুড় মঠে কুমারীপূজা' পুস্তিকাটিতে লিপিবদ্ধ করেছেন। এই সঙ্গে লেখকের উদ্বোধন-প্রকাশিত 'বেলুড় মঠে স্বামীজীর দুর্গাপূজা' পুস্তিকাটি পাঠকগণকে পড়তে অনুরোধ করি।

. . . .

আকর গ্রন্থ

(১) বৃহদ্ধর্মপুরাণ; (২) মার্কণ্ডেয়পুরাণ; (৩) তন্ত্রসার; (৪) পূজাপার্বণ ঃ যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি; (৫) হিন্দুদের দেবদেবী ঃ হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য; (৬) দেবীপুরাণ; (৭) দুর্গাপূজা পদ্ধতি ঃ নৃসিংহচন্দ্র বিদ্যাভূষণ।

বেলুড় মঠে কুমারীপূজা

স্বামীজীর কুমারীপূজা ও মাতৃবন্দনা

বেলুড় মঠে দুর্গাপূজার অন্যতম আকর্ষণ হলো 'কুমারীপূজা'। স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দও একাধিক কুমারীকে পূজা করেছিলেন বেলুড় মঠের প্রথম দুর্গাপূজায়। এই বিষয়ে একটি সুন্দর বিবরণ পাওয়া যায়—"...স্বামী বিবেকানন্দের ডাকে সাড়া দিয়ে মাতা (শ্রীশ্রীমা) ১৩০৮ সালে বেলুড়ে দুর্গাপূজায় উপস্থিত ছিলেন। ইহাই মঠে প্রথম দুর্গোৎসব। মায়ের অনুমতি লইয়া পূজার ব্যবস্থা এবং তাঁহার নামেই সঙ্কল্প হয়। এই উপলক্ষে মঠ-প্রাঙ্গণে বিরাট সুরম্য মণ্ডপ নির্মাণ করিয়া তাহাতে প্রতিমা স্থাপিত হইয়াছিল। মায়ের উপস্থিতিতে বিপুল উৎসাহ এবং আনন্দের মধ্যে মহাপূজা সুসম্পন্ন হয়। মায়ের নির্দেশে দেবীপূজায় পশুবলি বন্ধ থাকে।

"স্বামীজীর অনুরোধে গৌরীমা (শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিষ্যা) কুমারীপূজার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। পাদ্য-অর্ঘ্য-শঙ্খবলয়-বস্ত্রাদি সহযোগে স্বামীজী স্বয়ং নয়জন অল্প বয়স্কা কুমারীর পূজা করেন। এই সকল জীবন্ত প্রতিমার চরণে অঞ্জলি এবং তাঁহাদের হাতে মিষ্টান্ন দক্ষিণাদি প্রদান করিয়া স্বামীজী তাঁহাদিগকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করেন। একজন কুমারী এতই অল্প বয়স্কা ছিলেন এবং পূজাকালে এমনই ভাবাবিষ্টা হইয়াছিলেন যে তাঁহার কপালে রক্তচন্দন পরাইবার সময় স্বামীজী শিহরিয়া উঠিয়া বলিয়াছিলেন— 'আহা, দেবীর তৃতীয় নয়নে আঘাত লাগেনি তো'।" ('সারদা-রামকৃষ্ণ' : সন্ন্যাসিনী দুর্গাপুরী দেবী লিখিত)

এই পুস্তকে আরও উল্লেখ আছে, স্বয়ং শ্রীশ্রীমাও এই কুমারীদের ঐদিন 'এয়োরাণী' পূজা করেন। আজকাল বেলুড় মঠে মহাষ্টমী পূজার দিন পাঁচ থেকে সাত বছরের একটি কুমারীকে দেবীজ্ঞানে পূজা করা হয়। সালঙ্কারা, বেনারসী শাড়ি পরিহিতা একটি জলজ্যান্ত কুমারীকে

সাক্ষাৎ মা-দুর্গা-জ্ঞানে পূজা করে সকলের মধ্যে মাতৃ-ভাবেরই সঞ্চার করা হয় সেইসময়। এই পূজা দেখতে খুব ভিড় হয় ওইদিন বেলুড় মঠে।

স্বামীজীর কুমারীপূজা বিষয়ে কিছু আশ্চর্য কাহিনী বলার আগে, এই কুমারীপূজার তত্ত্বগত দিকটির কিছু আলোচনা করছি। দুর্গাপূজার সঙ্গে কুমারীপূজার বিধান সম্ভবত তান্ত্রিক মতে। দেবী দুর্গা স্বয়ংসম্পূর্ণা, পরমানন্দ-স্বরূপিণী। তিনি কারও গর্ভজাতা নন, অসুর নিধনের জন্য দেবগণের পুঞ্জীভূত তেজ থেকেই তাঁর জন্ম, সুতরাং তিনি স্বয়ংসিদ্ধা। বৃহদ্ধর্ম পুরাণের মতে, দেবী চণ্ডিকা এক কুমারী কন্যারূপেই দেবতাদের সামনে আবির্ভূতা হয়েছিলেন—'কন্যারূপেণ দেবানামগ্রতো দর্শনং দদৌ।' আবার তন্ত্রমতে, সকল কুমারীই দেবীর প্রতীক। তন্ত্রসারে পাই—'কুমারী যোগিনী সাক্ষাৎ কুমারী পরদেবতা।' মহাষ্টমীতে কুমারী পূজা অনুষ্ঠিত হলেও মহানবমীতে কুমারী পূজার বিধান

তন্ত্রসারেও আছে, যেমন 'মহানবম্যাং দেবেশি কুমারীং চ প্রপূজয়েৎ।'

কুমারী পূজা খুবই ফলদায়ী। তন্ত্রসারে আছে ঃ

"হোমাদিকং হি সকলং কুমারী পূজনং বিনা।
পরিপূর্ণফলং ন স্যাৎ পূজয়া তদ্ ভবেদ্ ধ্রুবম্।
কুমারীপূজয়া দেবী ফলং কোটিগুণং ভবেৎ॥
পুষ্পং কুমার্যৈ যদ্দত্তং তন্মেরুসদৃশং ফলম্।
কুমারী ভোজিতা যেন ত্রৈলোক্যং তেন ভোজিতম্॥"[১]

অর্থাৎ, যাগযজ্ঞহোম সকলই কুমারীপূজা ছাড়া সম্পূর্ণ ফলদায়ী নয়। কুমারী পূজায় দৈবী-ফল কোটিগুণ লাভ হয়। কুমারী পুষ্প দ্বারা পূজিতা হলে তার ফল পর্বতসমান। যিনি কুমারীকে ভোজন করান তাঁর দ্বারা ত্রিলোকেরই তৃপ্তি সাধিত হয়।

কুমারী সম্বন্ধে এইসব প্রশস্তির দ্বারা এটাই বোঝা যায়,

---

১ তন্ত্রসার (বঙ্গবাসী), পৃঃ ৯৭২

কুমারী দেবী ভগবতীর অতি সাত্ত্বিক রূপ অর্থাৎ সাধকের শুদ্ধ মনে দেবী এই রূপেও দেখা দেন। অন্য অর্থে, সাধকের শুদ্ধচৈতন্যেই কুমারীর দেবীত্ব ধরা পড়ে, মানবীয় স্থূল দৃষ্টি সেখানে অন্তর্হিত। যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণও কুমারীকে ভগবতীর অংশ বলেছেন।

কিন্তু কিভাবে এই কুমারীকে বেছে নেওয়া হয়? ঐ তন্ত্রসারেই আছে, এক থেকে ষোল বছর পর্যন্ত বালিকাদের কুমারী পূজার জন্য নির্বাচিত করা যেতে পারে। কিন্তু অবশ্যই তাদের ঋতুমতী হওয়া চলবে না। এক-এক বছরের কুমারীদের এক-এক রকম নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন, এক বছরের কন্যাকে বলা হয় 'সন্ধ্যা', দুই বছরের 'সরস্বতী', তিন বছরের 'ত্রিধামূর্তি', চার বছরের 'কালিকা', পাঁচ বছরের 'সুভগা', ছ বছরের 'উমা', সাত বছরের 'মালিনী', আট বছরের 'কুব্জিকা', নয় বছরের 'কালসন্দর্ভা', দশ বছরের 'অপরাজিতা', এগার বছরের 'রুদ্রাণী', বার বছরের 'ভৈরবী', তের বছরের 'মহালক্ষ্মী',

চোদ্দ বছরের 'পীঠনায়িকা', পনের বছরের 'ক্ষেত্রজ্ঞা' এবং ষোল বছরের কুমারীর নাম 'অম্বিকা'।[২]

আগেই বলা হয়েছে, শ্রীরামকৃষ্ণও কুমারীকে ভগবতীর অংশ বলেছেন। শুধু কুমারী নয়, তাঁর শুদ্ধ দৃষ্টিতে সব রমণীই সাক্ষাৎ ভগবতীর অংশ। নিজ পত্নী শ্রীমা সারদাদেবীকে 'ষোড়শী' রূপে পূজা করা সেই শুদ্ধ ভাবেরই দ্যোতক। এইভাবে সাধনার শেষে শ্রীরামকৃষ্ণ নিজ পত্নীকে পূজা করে ষোড়শীরূপিণী জগন্মাতার শ্রীপাদপদ্মে তাঁর সর্ববিধ সাধনার ফল সমর্পণ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ আরও বলতেন, 'মাতৃভাব বড় শুদ্ধভাব।' কুমারীর মধ্যে দৈবীভাবের প্রকাশ দেখা বা তাকে জননীরূপে পূজা করা সেই শুদ্ধসত্ত্বভাবেরই এক সার্থক প্রকাশ। বেলুড় মঠের দুর্গাপূজায় কুমারীপূজার অনুষ্ঠান তারই শাস্ত্রীয় ও বাস্তবায়িত রূপ এবং স্বামীজী এই ভাবই সঞ্চারিত করতে চেয়েছেন সকলের মধ্যে।

---

২ তন্ত্রসার, পৃঃ ৯৭২

স্বামীজীর কুমারীপূজা করা বিষয়ে কিছু আশ্চর্য কাহিনীও জানা যায়। তাঁর মানসকন্যা নিবেদিতা প্রভৃতিকে নিয়ে কাশ্মীর ভ্রমণকালে তিনি এক মুসলমান মাঝীর শিশু-কন্যাকে 'কুমারীপূজা' করেন, যা দেখে নিবেদিতাসহ তাঁর অন্যান্য পাশ্চাত্য শিষ্যারাও বিস্মিতা হন। পরিব্রাজক অবস্থার বিভিন্ন সময়ে তাঁর আরও কিছু শিশুকন্যাকে কুমারীরূপে পূজা করার কথা জানা যায়। এর মধ্যে খুবই আশ্চর্যজনক বিষয়, উত্তরপ্রদেশের (গাজীপুর) বিখ্যাত রায়বাহাদুর গগনচন্দ্র রায়ের (যিনি রবীন্দ্রনাথেরও ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন) শিশুকন্যা মণিকা রায়কে কুমারীরূপে পূজা করা। তথ্যটি পাওয়ার সূত্র হলো—'দেশ' পত্রিকায় (২২ সেপ্টেম্বর, ১৯৯০) এই লেখকের 'বেলুড় মঠের দুর্গাপূজা' শীর্ষক প্রবন্ধটি প্রকাশিত হওয়ার পর বহুজন কৌতূহলী হয়ে এই পূজা সম্বন্ধে লেখককে এবং 'দেশ' পত্রিকায় চিঠি লেখেন। সেই সময় নিউ দিল্লি থেকে সুবল গাঙ্গুলি একটি আশ্চর্য তথ্য প্রকাশ করেন একটি চিঠিতে। চিঠিটি

'দেশ' পত্রিকার (১০ নভেম্বর, ১৯৯০) সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। তারই কিছু অংশ : 'দেশ' ২২ সেপ্টেম্বর সংখ্যায় নব্বই বছর আগে বেলুড় মঠের দুর্গাপূজা শুরু হওয়ার ইতিহাস সম্বন্ধে স্বামী দেবেন্দ্রানন্দের সুলিখিত প্রবন্ধটিতে বহু তথ্য জানা গেল। ...বেলুড় মঠে স্বামীজীর নির্দেশে ও আগ্রহে 'দুর্গাপূজা' আরম্ভ হয় এবং লেখক ঐ উপলক্ষে কুমারীপূজা সম্বন্ধে জানিয়েছেন, বেলুড় মঠ স্থাপনার বহু আগে থেকেই স্বামীজীর দুর্গাপূজা ও কুমারীপূজা সম্বন্ধে ভীষণ ভক্তি ও আগ্রহ ছিল। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের তিরোধানের পর অপরিচিত পরিব্রাজক হিসাবে যখন নরেন্দ্রনাথ উত্তর ভারতে ভ্রমণরত, তখন গাজীপুরের (উত্তরপ্রদেশে) বিখ্যাত রায়বাহাদুর গগনচন্দ্র রায়ের বালিকা কন্যা মণিকা রায়কে কুমারীপূজা করেন বলে লিখিত আছে। পরবর্তী কালে এই মণিকা রায় লখনউ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভাইস চ্যান্সেলার (১৯২৩) ডঃ জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর স্ত্রী মণিকা চক্রবর্তী হিসাবে

পরিচিতা হন। দিলীপকুমার রায় তাঁর ইংরাজী 'যোগী কৃষ্ণপ্রেম' (১৯৬৮) গ্রন্থে লিখেছেন, এই মহিলা প্রকাশ্য পার্টিতে সেই যুগে মদ ও সিগারেট খেতেন। অথচ তাঁর গভীর আধ্যাত্মিক জীবন সম্বন্ধে বিশেষ কেউ জানতেন না। দিলীপ কুমার রায়ের মতোই লখনউ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজির অধ্যাপক রোনাল্ড নিক্সন মণিকাদেবীর আসল পরিচয় পান এবং ১৯২৮ সালে তাঁর কাছে দীক্ষা নিয়ে 'যোগী কৃষ্ণপ্রেম' হিসাবে সর্বভারতে পরিচিত হন। সেই ব্রিটিশ যুগের ভাইস-চ্যান্সেলারের স্ত্রী মণিকাদেবী স্বামী-পুত্র-সংসার ত্যাগ করে বৃন্দাবনে দীক্ষা নিয়ে 'যশোদা-মা' হিসাবে পরিচিতা হন এবং আলমোড়া থেকে আঠার মাইল দূরে দুর্গম মীরটোলা পাহাড়ী অঞ্চলে আশ্রম স্থাপন করে জীবনের শেষ দিনগুলি কাটান। তাঁর মানসপুত্র কৃষ্ণপ্রেমও (মৃত্যু ১৯৬৫) মীরটোলা আশ্রমে যশোদা মার সঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পূজায় নিযুক্ত হন। কিছুদিন আগে আলমোড়ায় গিয়ে রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিপূত বিশাল গৃহ,

বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক বশী সেনের গৃহ—যেখানে রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি আছে, আর আছে বহু গ্রন্থ, যার মধ্যে কিছু গ্রন্থ আলমোড়া থাকাকালীন উদয়শঙ্কর উপহার দিয়েছিলেন, সেইসব দেখে আসি। স্বামী বিবেকানন্দের স্মৃতিধন্য সেইসব গৃহ, সংরক্ষিত রাস্তা, সেই প্রস্তর যার ওপর ক্ষুধিত অপরিচিত নরেন্দ্রনাথ অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন, সেইসব দেখার পর সুদূর মীরটোলা আশ্রমে যাই। ... মীরটোলা আশ্রমে যেসব বিদেশীরা এখন যশোদা মার আশ্রম খুবই কৃতিত্বের সঙ্গে চালাচ্ছেন, তাঁরা যশোদা মার অতীত জীবন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু খবর রাখেন না। সেইস্থানে দীর্ঘদিন বসবাসকারী এক আইরিশ ভদ্রলোক (বর্তমানে ভারতীয় নাগরিক) আমার কাছে সর্বপ্রথম শুনলেন যশোদা মার জীবন ইতিহাস। ...অত্যাধুনিকা মণিকা চক্রবর্তীর যশোদা মা হিসাবে পরিবর্তনের পিছনে নিশ্চয়ই ছিল বাল্যকালে অপরিচিত, পরিব্রাজক বিবেকানন্দের গাজীপুরে কুমারীপূজা। সাক্ষাৎ শিব ছিলেন স্বামীজী। তাঁর স্পর্শে,

তাঁর দৃষ্টিপাতে কত যুগান্তকারী ঘটনা এদেশে, বিদেশে ঘটে গেছে তা এখনো বহু অজ্ঞাত।

যতদূর জানা যায় স্বামীজী চার-পাঁচবার (লিখিত তথ্য অনুযায়ী) কুমারীপূজা করেন। ১৮৯৮-তে অক্টোবর মাসে ক্ষীরভবানীতে তিনি ঐ পূজা করেন। ক্ষীরভবানী কাশ্মীরের এক অতি প্রাচীন দেবীপীঠ। এখানে একটি কুন্ড আছে। এই কুন্ডের জলেই দেবীর কাল্পনিক পূজা করা হয়। নিবেদন করা হয় 'ক্ষীর' বা 'পায়েস'—এটাই নিয়ম। যদিও স্বামীজীর কাশ্মীর-ভ্রমণে তাঁর সহযাত্রীদের মধ্যে মানসকন্যা নিবেদিতা ও শিষ্যা মিস্ ম্যাকলাউড ছিলেন আর ছিলেন দুজন গুরুভাই, কিন্তু স্বামীজী এই সময় প্রায় একাকীই থাকতেন এবং ক্ষীরভবানীর প্রথা অনুযায়ী পূজা করতেন, 'পায়েস'ও নিবেদন করতেন। সেই সঙ্গে প্রতিবারই একজন ব্রাহ্মণ-শিশুকন্যাকে কুমারীজ্ঞানে পূজা করতেন। ভারতের অন্যতম শক্তিপীঠ কামাখ্যাতে গিয়েও স্বামীজীর কুমারীপূজা করার কথা জানা যায় সেখানকার পাণ্ডাদের পুরান খাতা থেকে।

জানা যায়, সেখানকার প্রথানুযায়ী তিনি সঙ্গীদের নিয়ে কুমারীপূজা ও কুমারীভোজন করান। পরিব্রাজক-অবস্থায় গাজীপুরের শিশু 'মণিকা'কে কুমারীপূজার কথা আগেই বলা হয়েছে। সবশেষে বেলুড় মঠের প্রথম দুর্গাপূজায় (১৯০১) নয়জন কুমারীকে পূজা করা এবং তাদের মধ্যে একজনকে নিজেই পূজা করেন।[৩] এই চারবার ছাড়াও অন্য আরো কয়েকবার স্বামীজীর সাধারণভাবে বা প্রথানুযায়ী কুমারীপূজা করার বিষয়ে জনশ্রুতি আছে। মোটকথা মাতৃভাবময় শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্য নরেন্দ্রনাথ তথা বিবেকানন্দ কোন্ উচ্চকোটির মহামানব ছিলেন তা তাঁর নারীমাত্রকেই জগজ্জননী জ্ঞান করা বা পূজা করার আন্তরিক আগ্রহ বা পূজা করার ঘটনাগুলি থেকেই উপলব্ধি করতে পারি, যা আমাদের সাধারণ সীমাবদ্ধ বুদ্ধিতে অভাবনীয়—বিবেকানন্দের তুলনা বিবেকানন্দই!

বাস্তবিকই স্বামীজীর এইসব কুমারীপূজা করার কথা

৩ উদ্বোধন, আশ্বিন, ১৪০৫

অর্থাৎ কুমারী বা রমণীমাত্রকেই জগন্মাতা জ্ঞান করা অত্যাশ্চর্য মনে হয় যখন আমরা তাঁর বৈদান্তিকসত্তার কথা ভাবি। স্বয়ং মা-কালীকে এক সময় তিনি ঠাট্টা করে বলতেন—'পুত্তলিকা'। নির্মায়া নির্মোহ বৈদান্তিক সন্ন্যাসীর কাছে 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' ব্রহ্মই একমাত্র ধ্যেয়। সেই বিবেকানন্দের এ-হেন কুমারীপূজা ও মাতৃবন্দনা অত্যাশ্চর্য ও রহস্যজনকই মনে হয়। এর পিছনে গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের অমোঘ শক্তি ও অনুপ্রেরণা নিশ্চয়ই ছিল, কিন্তু কী দুর্জ্ঞেয় রহস্যে বৈদান্তিক বিবেকানন্দের এই রূপান্তর তা আমাদের মানুষী বুদ্ধিতে বোঝা দুঃসাধ্য। এবং বিবেকানন্দ নিজেও এই রহস্যজাল কোনদিন ছিন্ন করেননি, কেবল একবার ভগিনী নিবেদিতার এই বিষয় জানার প্রবল উৎসাহের চাপে পড়ে এইটুকু মাত্র বলেছিলেন—'That will die with me'. অর্থাৎ, আমার মরণের সঙ্গে তাও নিঃশেষিত হয়ে যাবে।*

---

* লোকমাতা নিবেদিতা, (শঙ্করীপ্রসাদ বসু), দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ১০৭

কিন্তু না, হয়তো সম্পূর্ণ নিঃশেষিত হয়নি যখন আমরা বিবেকানন্দ-জীবনের সাফল্যের চাবিকাঠির অন্যতম কারণ হিসাবে এই মাতৃবন্দনা বা নারীমাত্রকেই জগজ্জননী দৃষ্টিতে দেখার বিষয় ভাবি। অন্য অর্থে সাধক বিবেকানন্দের উত্তরণ এইভাবেই। যথার্থ সন্ন্যাসী কায়মনোবাক্যে পরিশুদ্ধ, জাগতিক কামনা-বাসনা-মায়া-মোহের অগ্নি পরীক্ষায় বিবেকানন্দ বারবার সসম্মানে উত্তীর্ণ। পাশ্চাত্যেও স্বামীজী নিজের এই অন্তর্নিহিত শক্তির প্রকাশ দেখে নিজেই অবাক। আমরা তো জানি, স্বর্গের দেবতাদের আসনও টলে যায় রমণীর সৌন্দর্যে, মায়া-মোহে। কিন্তু বিবেকানন্দ? তিনি নির্ভয়, কারণ রমণীমাত্রেই যে তাঁর কাছে মা—জগজ্জননী! পাশ্চাত্যে বিবেকানন্দের সাফল্য ও ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ ও প্রভাবিত এক অতুল ঐশ্বর্যশালিনী ও রূপবতী নারী যখন তাঁর কাছে আত্মনিবেদন করেন এই বলে—"আপনি আমার ঐশ্বর্যসহ আমাকে গ্রহণ করুন"—তখন স্বামীজী তাঁর এই আত্মনিবেদনের অর্থ বুঝতে পেরে তাঁকে

প্রবোধ দেন এই বলে—“মহাশয়া, আমি যে সন্ন্যাসী, আমাকে তো বিবাহ করতে নেই, জগতের সকল রমণীই যে আমার মাতৃস্বরূপা।”

বিবেকানন্দের কুমারীপূজা তথা মাতৃবন্দনার এই হলো ‘প্র্যাকটিক্যাল ডিমনস্ট্রেশন’। অবশ্য তাঁর এমন ‘প্র্যাকটিক্যাল ডিমনস্ট্রেশন’ তথা অগ্নিপরীক্ষা দেওয়া শুরু শিকাগো ধর্মমহাসভায় অভূতপূর্ব সাফল্যলাভের অব্যবহিত পর থেকেই। সেই ধর্মমহাসভায় উপস্থিত মিসেস এম. কে. ব্লজেট এই অত্যাশ্চর্য ও অবিস্মরণীয় ব্যাপারটি সম্বন্ধে একটি সুন্দর অভিমত লিপিবদ্ধ করেন—“আমি ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দের শিকাগো ধর্মমহাসভায় উপস্থিত ছিলাম। সেই যুবকটি (স্বামী বিবেকানন্দ) উঠিয়া যখন বলিলেন—‘আমার আমেরিকাবাসী বোন ও ভাইরা’, তখন (সমবেত) সাত হাজার নরনারী এমন কি একটা কিছুর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদনার্থ উঠিয়া দাঁড়াইল যাহা তাহারা ভাষায় প্রকাশ করিতে সমর্থ ছিল না। যখন বক্তৃতা শেষ হইল, তখন

দেখিলাম, দলে দলে নারীরা তাঁহার সান্নিধ্য লাভের জন্য বেঞ্চি ডিঙাইয়া অগ্রসর হইতেছে। আমি তখন মনে মনে বলিলাম, দেখো বাছা, এ আক্রমণে যদি তুমি মাথা ঠিক রাখিতে পার, তো তুমি ভগবান।"*

সারাজীবন কায়মনোবাক্যে তিনি শুদ্ধ-অপাপবিদ্ধ। সন্ন্যাসজীবনের Acid Test অন্তর্নিহিত শুচিতা—বিবেকানন্দ সেই অগ্নিপরীক্ষায় বারবার সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছেন। নিজের এই অলৌকিক শক্তিতে নিজেই অবাক হয়ে ভোগবাদের দেশ আমেরিকা থেকে সে সময়ে লিখেছেন এক পত্রে ঃ "তিনি (শ্রীরামকৃষ্ণ) যে রক্ষা করছেন, দেখতে পাচ্ছি যে। ওরে পাগল, পরীর মতো মেয়ে সব, লাখ লাখ টাকা—ও সকল তুচ্ছ হয়ে যাচ্ছে, এ কি আমার জোরে? না, তিনি রক্ষা করছেন?" (পত্রাবলী, সংখ্যা ২২৬) স্বামীজীর এই দীনতা তাঁর গুরুভক্তির নিদর্শন হলেও স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ যে তাঁকে

---

* যুগনায়ক বিবেকানন্দ (স্বামী গম্ভীরানন্দ) দ্বিতীয় খণ্ড, ১ম সং, পৃঃ ৩১

'জিতেন্দ্রিয়' বলে অভিহিত করেছিলেন, তাও তো আমরা জানি।

বিবেকানন্দের মাতৃবন্দনা বা পূজার সর্বশ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত বোধ করি শ্রীমা সারদাদেবীকে শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ-জননীরূপে অধিষ্ঠিতা করে তাঁকে জগজ্জননী জ্ঞানে 'জ্যান্ত দুর্গা' বলে বন্দনা করা। কোন্ উচ্চ আদর্শে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ আন্দোলনকে বিশ্বব্যাপী সক্রিয় রাখতে চেয়েছিলেন, পাশ্চাত্যে বসেই তাঁর লেখা সেই ঐতিহাসিক চিঠির কিছু অংশ উদ্ধৃত করে প্রসঙ্গটি শেষ করছি। চিঠিটি লিখেছেন তাঁর গুরুভ্রাতা স্বামী শিবানন্দকে ঃ "মা-ঠাকরুণ কি বস্তু বুঝতে পারনি, এখনো কেহই পার না, ক্রমে পারবে। ভায়া, শক্তি বিনা জগতের উদ্ধার হবে না। আমাদের দেশ সকলের অধম কেন? শক্তির অবমাননা সেখানে বলে। মা-ঠাকুরাণী ভারতে পুনরায় সেই মহাশক্তি জাগাতে এসেছেন, তাঁকে অবলম্বন করে আবার সব গার্গী, মৈত্রেয়ী জগতে জন্মাবে।

"দেখছো কি ভায়া, ক্রমে সব বুঝবে। এই জন্য তাঁর মঠ প্রথমে চাই। রামকৃষ্ণ পরমহংস বরং যান, আমি ভীত নই। মা-ঠাকুরাণী গেলে সর্বনাশ! শক্তির কৃপা না হলে কি ঘোড়ার ডিম হবে! আমেরিকা, ইউরোপে কি দেখছি? শক্তির পূজা, শক্তির পূজা। (অর্থাৎ, রমণীদেরই অতিমাত্রায় প্রাধান্য দেওয়া—লেখক।) তবু এরা অজান্তে করে, কামের দ্বারা করে। আর যাঁরা বিশুদ্ধভাবে, সাত্ত্বিকভাবে, মাতৃভাবে পূজা করবে, তাদের কি কল্যাণ না হবে! আমার চোখ খুলে যাচ্ছে, দিন দিন সব বুঝতে পারছি। সেইজন্য আগে মায়ের জন্য মঠ করতে হবে। আগে মা আর মায়ের মেয়েরা, তারপর বাবা আর বাপের ছেলেরা, এই কথা বুঝতে পারো কি?" (পত্রাবলী, সংখ্যা-১৫৪) (স্বামীজী এখানে সম্ভবত শ্রীমাকে কেন্দ্র করে ভারতে স্ত্রী শিক্ষা আন্দোলনের কথাই বলতে চেয়েছেন, পরবর্তী কালে ভগিনী নিবেদিতার মাধ্যমে যার সার্থক সূচনা। —লেখক)

কুমারীপূজা কি ও কেন

মর্তলোকে গিরিরাজ বা হিমালয় কন্যা উমা অসুরদলনী—মহিষাসুরমর্দিনী এবং ভক্তজনের দুর্গতি-নাশিনী দুর্গা। তিনি আবার শিবকে পতিরূপে বরণ করে কৈলাসে ঘর-সংসারও পেতেছেন। প্রতি বছর শরৎকালে পুত্র কন্যা সমভিব্যাহারে আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষে চারটি দিনের জন্য তাঁকে পিতৃগৃহে বা মর্তে আসতে হয় ভক্তজনের পূজা গ্রহণ করতে। এই চারদিনের একদিন তাঁকে কুমারীরূপেও পূজা করা হয় জলজ্যান্ত একটি কুমারীকে প্রতীক হিসাবে তাঁর পাশে বসিয়ে। কিন্তু কুমারীপূজার সঙ্গে তাঁর কি সম্বন্ধ? মা হয়েও তিনি কি করে কুমারী হলেন? তারই সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে করা হচ্ছে।

কুমারীপূজা বিষয়ে বিভিন্ন শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

তন্ত্রসারের কুমারীপূজায় দেবীর এক থেকে ১৬ বছরের কুমারীদের বিভিন্ন নামের কথা আগেই বলা হয়েছে। বৃহদ্ধর্মপুরাণে দেবী কুমারীর একটি অন্যরূপের উল্লেখ পাওয়া যায়। একদা ব্রহ্মা স্বয়ং দেবতাদের সঙ্গে মর্তে এসে এক বিল্ববৃক্ষের পত্রাচ্ছাদিতা নিরাভরণা তপ্তকাঞ্চনবর্ণা নিদ্রিতা একটি নবজাত বালিকা কন্যাকে দেখতে পেয়েছিলেন। দেবগণ বালিকাটিকে জাগ্রত করার জন্য স্তব করেন—

"তস্যৈকপত্রে রুচিরে সুচারুনবমালিকাম্।
নিদ্রিতাং তপ্তহেমাভাং বিম্বোষ্ঠীং তনুমধ্যমাম্।
অনাবৃতাঙ্গাং নিশ্চেষ্টাং রুচিরাং নবমালিকাম্॥"[৪]

দেবতাদের স্তবে সন্তুষ্ট হয়ে এই অনুপমা বালিকা জাগ্রতা হয়ে বাল্যভাব ত্যাগ করে এক উগ্রচণ্ডী যুবতী নারীতে রূপান্তরিতা হন।

---

৪ বৃহদ্ধর্ম; পূর্বখণ্ড, ২২/২

"এবং স্তোত্রৈঃ সা প্রবুদ্ধা মহেশী
বাল্যং ত্যক্ত্বা সা যুবত্যাস্তে সদ্যঃ।
নিদ্রাং ত্যক্ত্বা চোত্থিতা দৈবতানাং
দৃষ্টিং প্রাপ্তা চোগ্রচণ্ডেতি নাম্না।"[৫]

দেবতাদের তেজ বা দৃষ্টিতে বা স্তবে উত্থিতা এই কুমারী বালিকাই চণ্ডিকা। ইনিই জাগ্রতা হয়ে সবংশে রাবণ-নিধনের বর দিয়েছিলেন। এই কুমারী দেবীর বিল্বশাখায় আবির্ভাব ও জাগ্রতা হওয়ার ঘটনা থেকেই কি বিল্ববৃক্ষমূলে দেবীর বোধনের সূচনা? অবশ্য শাস্ত্রকারগণের সকলেই এ বিষয় একমত নন।

কুমারীপূজার ধ্যানমন্ত্রে আছে—

"বালরূপাঞ্চ ত্রৈলোক্যসুন্দরীং বরবর্ণিনীম্।
নানালঙ্কার নম্রাঙ্গীং ভদ্রবিদ্যাপ্রকাশিনীম্॥

---

৫ বৃহদ্ধর্ম; পূর্বখণ্ড, ২২/১২

চারুহাস্যং মহানন্দহৃদয়াং শুভদাং শুভাম্।
ধ্যায়েৎ কুমারীং জননীং পরমানন্দরূপিণীম্॥"[৬]

দেবী ভগবতী এখানে কুমারীরূপেই ধ্যেয়। তাঁর কুমারীত্ব মানবীভাবে বোঝা দুঃসাধ্য। কারণ, তিনি দেবতাদের তেজঃ-সম্ভূতা। শিব-জায়া হয়েও তিনি কুমারী। "পৌরাণিক কাহিনী অনুসারে উমা-পার্বতী শিব-জায়া হলেও প্রকৃতপক্ষে পুত্রকন্যার জননী নন। কার্তিকেয়ও তাঁর গর্ভজাত পুত্র নন।" পণ্ডিত যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি লেখেন—"দুর্গা কুমারী। তাঁহার পুত্রকন্যা নাই। এই কারণে দুর্গাপূজায় কুমারীপূজা বিহিত হইয়াছে।"

তান্ত্রিক মতে কিন্তু সকল কুমারীই দেবীর প্রতীক। দেবী দুর্গার পূজা শেষে কুমারীদের ভোজন করানো বিষয়েও শাস্ত্রীয় বিধান আছে। যেমন দেবীপুরাণে বলা হয়েছে—'নৈবেদ্যং শালিজং ভক্তং শর্করা কন্যকাস্বপি।[৭] শালিচালের

৬ 'দুর্গাপূজা পদ্ধতি', নৃসিংহচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, পৃঃ ৯২
৭ দেবীপুরাণ, ৩৩/৯১

ভাত মিষ্টান্ন-সহকারে কুমারীদের খাওয়াতে হবে। আবার তন্ত্রসারে সব কুমারীদের শিব-পার্বতীর অংশ-সম্ভূতা বলা হয়েছে, দেবী তা নিজেই স্বীকার করে শিবকে বলছেন—"কুমারিকা হি অহং নাথ সদা ত্বং কুমারিকা।"[৮] অর্থাৎ, হে নাথ, আমিও কুমারী, তুমিও কুমারী। এই অর্থে তন্ত্রের শিব-শক্তির একাত্মতাই স্বীকৃত হলো।

কুমারীপূজা ও কুমারীভোজনের বিষয়ে এই প্রসঙ্গে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের প্রতিষ্ঠাত্রী জানবাজারের রানী রাসমণির দুর্গাপূজারও উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি প্রতিবছর দুর্গাপূজায় কুমারীপূজা করে এক হাজার থেকে বারশ কুমারীকে পরিতৃপ্তি সহকারে ভোজন করাতেন এবং তাদের শাড়ি ও অন্যান্য উপহারও দিতেন।[৯]

কুমারী সম্বন্ধে এইসব প্রশস্তির দ্বারা এটাই বোঝা যায়, কুমারী দেবী ভগবতীর অতি সাত্ত্বিক রূপ। জগন্মাতা বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্ত্রী হয়েও চিরকুমারী। সেইজন্য প্রত্যেক

৮ তন্ত্রসার, পৃঃ ৯৭৩

৯ উদ্বোধন, আশ্বিন, ১৪০৬

শক্তিপীঠেই কুমারী পূজার রীতি প্রচলিত। আসামে কামাখ্যা মন্দিরেও কুমারীপূজা প্রচলিত। দেবীর এই কুমারী রূপ ও কুমারীপূজা সম্বন্ধে বিভিন্ন পুরাণেও ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। শ্রীশ্রীচণ্ডীতেও দেবীকে কুমারী রূপে প্রণাম জানানো হয়েছে—"কৌমারীরূপসংস্থানে নারায়ণি নমোঽস্তুতে।" দেবী পুরাণে এই নামের স্বপক্ষে বলা হয়—"কুমারী-রূপধারী চ কুমার-জননী তথা। কুমারী রিপুহন্ত্রী চ কৌমারী তেন সা স্মৃতা।" অর্থাৎ, তিনি রূপে কুমারী, কুমারের (কার্তিকেয়) জননী এবং কুমারীরূপেই রিপুনাশিনী (ইন্দ্রিয়গণ তো শত্রুর মতোই দুর্দমনীয়) বলেই তাঁকে কুমারী হিসাবে স্মরণ করা হয়। আগেই বলা হয়েছে, জগন্মাতা সবকিছুর সৃষ্টিকর্ত্রী হয়েও চিরকুমারী। সেই অর্থে তিনি এক ও অদ্বিতীয়া। শুম্ভ-নিশুম্ভ বধের সময় দেবী সেই কথাই বলেছেন—"একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা।" (মার্কণ্ডেয় পুরাণ) অর্থাৎ, শক্তিরূপে জগতে কেবল আমিই একমাত্র বিরাজিতা। আমার তুল্য দ্বিতীয় কোন্ শক্তি আছে?

এখানে স্পষ্টতই দেবী ব্রহ্ম ও শক্তির অভেদ তত্ত্বের কথাই বলেছেন। এবং উপনিষদেও ব্রহ্মকে কুমার এবং কুমারী দুই-ই বলা হয়েছে—"ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানাসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী।"

কিন্তু এসব তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা সত্ত্বেও যেহেতু দুর্গা শিবজায়া—শিবের ঘরণী, সেজন্য তাঁকে প্রচলিত অর্থে কুমারী বলা যায় না। দুর্গাকে কুমারী বলা এবং দুর্গাপূজার বিধান দেওয়া সম্বন্ধে বৃহদ্ধর্ম পুরাণের কাহিনীও এখানে স্মরণ করা যেতে পারে। দেবতাদের প্রার্থনায় সবংশে রাবণ নিধনের জন্য দেবীর বিল্বশাখায় আবির্ভাবের কথা জানা যায়। বিল্ববৃক্ষতলে দেবীর বোধনের তাৎপর্যও বোধ হয় এস্থলে নিহিত। বিল্ববৃক্ষে আবির্ভূতা সেই কুমারী বালিকাই দেবী চণ্ডিকারূপে আত্মপ্রকাশ করেন। তাই বোধ হয় বিল্ববৃক্ষও দেবীর প্রতীক। এখানে দেবীকে বলা হয়েছে 'তপ্তকাঞ্চনবর্ণা'—বিল্বকাষ্ঠের অরণিতে জাত অগ্নিশিখাও 'তপ্তকাঞ্চনবর্ণা'। বেদে অগ্নিকে বলা হয়েছে কুমার ও যুবা।

অগ্নি কুমার বলেই অপরিহার্য বিল্বকাষ্ঠের যজ্ঞাগ্নি বা অগ্নিশিখারূপিণী দুর্গাও কুমারী। আগেও বলা হয়েছে, দেবীর কুমারীত্ব তন্ত্রমতেও স্বীকৃত। বিভিন্ন শক্তিপীঠ, এমনকি ভারতবর্ষের শেষ প্রান্তে অবস্থিত কন্যাকুমারীতেও দেবী কুমারীরূপেই পূজিতা। এই কুমারীপূজার রীতি থেকেই সম্ভবত একদা বাংলাদেশে গৌরীদান প্রথা এসেছিল। আদিবাসী সমাজেও এই কুমারীপূজা বা গৌরীদান প্রথা প্রচলিত। কোন কোন আদিবাসী সমাজের কুমারী মেয়েরা আশ্বিন মাসের এক বিশেষ তিথিতে সতের দিন উপবাস করে 'কুমারী ওযা' ব্রত পালন করে। কাজেই কেবল আর্য সংস্কৃতিতে নয়, অনার্য সংস্কৃতিতেও কুমারীপূজা কোন একভাবে প্রচলিত আছে। ভারতের বিভিন্ন দেবীপীঠে কুমারীপূজা করার কথা ইতঃপূর্বেই বলা হয়েছে। ভারতে ও বহির্ভারতে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের যেসব শাখাকেন্দ্র আছে, সেসব স্থানেও কোন কোন দুর্গাপূজায় কুমারীপূজা অনুষ্ঠিত হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, মাতৃভাব বড় শুদ্ধভাব। কুমারীর মধ্যে দৈবীভাবের প্রকাশ দেখা বা তাকে জননীরূপে পূজা করা সেই শুদ্ধসত্ত্ব ভাবেরই এক সার্থক প্রকাশ। দুর্গাপূজায় কুমারীপূজার অনুষ্ঠান তারই শাস্ত্রীয় ও বাস্তবায়িত রূপ।

এইভাবেই নানা রূপে ও ভাবে আর্য ও অনার্য সংস্কৃতিতে অতি প্রাচীনকাল থেকেই শিবজায়া দুর্গা কুমারীরূপে পূজিতা হয়ে আসছেন। শাস্ত্রীয় প্রমাণ ছাড়াও আসামে কামাখ্যামন্দিরের মতো দক্ষিণ ভারতের শেষ প্রান্তে কন্যাকুমারীতে অধিষ্ঠিতা দেবীর কুমারী নামটির প্রাচীনত্বের কথা খ্রীস্টীয় প্রথম শতকে লেখা জনৈক বিদেশী সাহেবের 'Periplus of Erythriaecan Sea' গ্রন্থে উল্লেখ আছে যথা—"...Beyond this there is another place called Comari at which are the cape of the Comari and a harbour ; hither come those men who wish to consecrate themselves for the rest of their lives, and bathe and dwell in celibacy and women also do the same ; for it is told that a goddess once dwelt here and bathed." (Schoff, Page 46)

এখানে আশ্চর্য সেই ঘটনা, এই কন্যাকুমারী পীঠেরই শিলাতে বসে ধ্যানস্থ বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ কর্তৃক সাগরপারে যাওয়ার ইঙ্গিত পান তাঁর ব্রত উদযাপনের জন্য এবং তারপরেই শ্রীমা সারদাদেবী কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে তাঁর বিদেশগমন ও বিশ্বজয়। ধর্মসাধনার ইতিহাসে কন্যাকুমারী পীঠের মতো সে কথাও আজ এক ইতিহাস, যে-স্মৃতি বহন করছে সেই একই পীঠস্থানে বিশাল বিবেকানন্দ-স্মৃতি-মন্দির—যা আজ অগণিত দেশ-বিদেশের পর্যটক ও পুণ্যার্থীদের নিত্য আকৃষ্ট করছে। যে বিবেকানন্দ আজীবন রমণীমাত্রকেই জননী বা দেবীজ্ঞান করেছেন এবং নানা সময়ে শিশু কুমারীকন্যাদের কুমারীপূজা করেছেন (যার মধ্যে এক মুসলমান মাঝীর কন্যাও আছে) সেই বিবেকানন্দের বিশ্বধর্ম-মহাসভায় যোগদানের অলৌকিক এক প্রেরণা এই কুমারী জননীর পাদপীঠে বসেই, তার পেছনে কোন্ মহাশক্তির লীলাখেলা, তা আমাদের বুদ্ধি ও যুক্তির সীমানার বাইরেই থাকবে চিরকাল।

উদ্বোধন প্রকাশনার কতিপয় পুস্তক

লেখকের কতিপয় পুস্তক

কলকাতার ছেলে বিবেকানন্দ

কলকাতাবাসিনী শ্রীমা সারদামণি

চিরজাগ্রত বিবেকানন্দ

বেলুড় মঠে স্বামীজীর দুর্গাপূজা

শান্তিরূপিণী সারদা

দেবী-মানবী সারদা

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দে [illegible] পিতা

উদ্বোধন কার্যালয়
কলকাতা

Order for books may be placed at : baghbazar.publication@rkmm.org

মূল্য : ৫.০০

Balur Mathe Kumari Puja
₹5.00